পলতাগড়ের অনিন্দ্যসুন্দর মনসামূর্তি

রূপক সামন্ত

গোড়ার কথা ঃ মে মাসের ভয়ঙ্কর গরমে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমার স্কুলের গরমের ছুটি চলছে। এ সময় হুগলি জেলার লৌকিক দেব-দেবীদের নিয়ে কৌশিক পালচৌধুরীর বইগুলি পড়ছিলাম আর আশ্চর্য হচ্ছিলাম। হঠাৎ একদিন বর্ষিয়ান আঞ্চলিক ইতিহাসকার ও লোকসংস্কৃতিবিদ্ ড. শিবেন্দু মান্না চলভাষে আমাকে সিঙ্গুর-পলতাগড়ের মনসামূর্তির হদিশ দিলেন। তিনি একটি পুরোনো পত্রিকায় মূর্তিটি সম্পর্কে পড়েছেন। আমাকে খোঁজ-খবর করতে আর ছবি তুলে আনতে নির্দেশ দিলেন তিনি। শেষে সন্দেহের সুরে বললেন—লেখাটা অনেককাল আগের। মূর্তিটাও বিশেষ প্রাচীন। রাস্তার ধারে শিবপুকুরের পাড়ে বটগাছের তলায় পড়ে আছে। দ্যাখ আবার কেউ তুলে নিয়ে গিয়ে পাচার করে দিলে কি না! আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার পিসতুতো ভাই সোমশুভ্র সাঁতরাকে বিষয়টি চলভাষে জানালাম। শুভ্র বর্তমানে সিঙ্গুরের বাসিন্দা হলেও তাদের আদি বাড়ি জলাপাড়া যেতে হলে এই পলতাগড় হয়েই যেতে হয়। শুভ্র বেশ কিছুদিন পরে আমাকে জানালো যে সত্যিই মূর্তিটা আছে। তবে সে বটগাছ নেই। আর এখন একটা ছোট মন্দির হয়েছে সেখানে। তারপর নানা কাজে সময় করে উঠতে পারি নি। শেষে ০৯-০৭-২০১৪ তারিখে, বুধবার দুপুর ৩-৪০ মিনিটে সিঙ্গুর থেকে শুভ্রর মোটরসাইকেলে চেপে হাজির হলাম পলতাগড়ের মনসাতলায়। আমাদের সঙ্গে যোগ দিল শুভ্রর বন্ধু, পলতাগড়ের লাগোয়া গ্রাম বিরামনগরের বাসিন্দা সনৎ মাজি। আকাশে মেঘের কারণে ভ্যাপসা গরমের দুপুর ছিল সেটা। জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকে চমকে গেলাম। এত সুন্দর মূর্তি এভাবে পড়ে আছে এখানে! চুরি হয়ে যায় নি এটাই ভাগ্যের। আমি ছবি তুললাম—মূর্তি আর মন্দিরের। তারপর স্থানীয় দু'জন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে কিছু তথ্য জানতে পারলাম। সেগুলিই এবার নিবেদন করি। শিবেন্দু মান্না প্রেরিত উপরোক্ত প্রবন্ধ এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যাদিও এই সঙ্গে উল্লেখিত হল।

অবস্থান ঃ গ্রাম ও গ্রাম-পঞ্চায়েত—পলতাগড়, জেলা- হুগলি। পলতাগড় শ্মশান পার হয়ে বড়া-র দিকে যেতে মোরাম রাস্তার বাঁ-ধারে ছোট বিশেষত্বহীন সিমেন্টের মন্দির। হাওড়া-তারকেশ্বর-আরামবাগ রেলপথে সিঙ্গুর স্টেশনে নেমে, মহামায়া উচ্চবিদ্যালয় পার হয়ে, সাতমন্দিরতলার পাশ দিয়ে গিয়ে বাঁয়ে বেঁকে অপূর্বপুর। এই অপূর্বপুরে ডানহাতি চওড়া মোরাম রাস্তা চলে গেছে কামারাঙাতলা মাঠের গা ঘেঁষে। সাত অশ্বত্থতলার মাঠ পেরিয়ে কিছুটা যাবার পর ডানদিকে পলতাগড় শ্মশান। এখানে রাস্তার পাশেই পাকা দালান মন্দিরে আছেন শ্মশানকালী, কষ্টিপাথরের মূর্তি। এই শ্মশান

পেরিয়ে কিছুটা যাবার পর রাস্তার বাঁ-ধারে লাল মেঝের বাঁধানো চাতালের উপর ছোট মন্দির। মোরাম রাস্তাটা চলে গেছে পলতাগড়, বিরামনগর হয়ে বড়া-তেলীর মোড়ে। সিঙ্গুর স্টেশন থেকে আন্দাজ আড়াই-তিন কিলোমিটার পথ। যাতায়াতে রিক্সা ছাড়া গতি নেই। অবশ্য পায়ে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে।

মন্দির সম্পর্কিত তথ্যাদি ঃ ছোট, সিমেন্টের তৈরী, বিশেষত্বহীন মন্দির। গ্রীলের গেট তালাবন্ধ থাকে না। ভিতরে সাদা টালি বসানো মেঝে, দেওয়াল। একটি বেদীর উপর মূর্তিটি বসানো আছে। বেদীর নীচে একটি পাথরের পাত্রে বসানো আছে পিতলের ঘট। ঘটের উপর আম্রপল্লব, লাল গামছা ঢাকা। মন্দিরের পিছনে শিবপুকুরের পাড় বরাবর বাঁশঝাড়। সব মিলিয়ে প্রায় ২০ বিঘা জলকর। এটি অতীতে স্থানীয় বর্মণ জমিদারদের সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তির বর্তমান মালিকানা সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য স্থানীয় বাসিন্দারা জানাতে পারলেন না। তবে জেলেরা আজও এই পুকুরে মাছ চাষ করে। মূর্তিটি এই পুকুরের পাড়ে এক বিশাল বটগাছের নীচে ফণিমনসার ঝোপে দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ষাট বছর বয়সী সত্যচরণ দে জানালেন যে তাঁর বাবাও ছোটবেলা থেকে মূর্তিটিকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখেছেন। মূর্তিটি কিভাবে এখানে এল তা কেউ বলতে পারলেন না। একবার এক সাধু মূর্তিটি নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলেও গ্রামবাসীদের বাধায় তা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে বটগাছ ও ফণিমনসার ঝোপ কোনটাই নেই। ১৩৮৯ সালে অপূর্বপুরের বাসিন্দা স্বপন ব্যানার্জির স্ত্রী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ছোট মন্দিরটি তৈরী করে দেন। স্বপনবাবু ছিলেন কাশীপুর গান-শেল ফ্যাক্টরীর কর্মী। সেই সঙ্গে তিনি জ্যোতিষ-বিদ্যাতে ও পারদর্শী ছিলেন। মন্দিরের উল্টোদিকে নিমাই দে-র সাইকেল সারানোর ছোট পাকা দোকান ও সংলগ্ন বাড়ি। তিনি বললেন যে, স্বপনবাবুর জ্যোতিষবিদ্যার নিদান ও মুখের কথা ছিল অব্যর্থ। নিমাইবাবুও নিজের জীবনে এর প্রমাণ পেয়েছেন এবং স্বপনবাবুর নির্দেশ মত কাজ করে কিছু উন্নতিও করেছেন। তিনি সাইকেল দোকানের লাগোয়া একটি ছোট ঘর তৈরী করে স্বপনবাবুর জ্যোতিষচর্চার কেন্দ্র করে দিয়েছিলেন। স্বপনবাবু বর্তমানে দীর্ঘদিন নিখোঁজ। তিনি বেঁচে আছেন কি না তাও জানা নেই। তবে বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর হত বলে নিমাইবাবু জানালেন।

মূর্তির বিবরণ ঃ একচালা কালো কষ্টিপাথরের মূর্তিটি সৌন্দর্যে অনুপম। উচ্চতা প্রায় দু'ফুট। পদ্মফুলের পাপড়ির উপর দেবী ললিতাসনে বসে আছেন। মাথায় মুকুট, তার উপর ন'টি নাগফণার ছত্র। মুখের ভাব কমনীয়, অনিন্দ্যসুন্দর। আয়তলোচনা এই দেবীর কপালে সিঁদুর লেপা থাকায় ত্রিনয়ন আছে কি না বোঝা যায় না। চতুর্ভুজা দেবী উপরের দুহাতে ধরে আছেন একটি করে ত্রিফণা নাগদেহ। নীচের বাঁ হাত দিয়ে বাঁ কোলের উপর একটি জোড়হস্ত শিশুকে ধরে রেখেছেন। নীচের ডান হাঁটুর উপর স্থাপিত হাতের তালু

উপরের দিকে। অন্য আঙুলগুলি সটান হলেও বৃদ্ধা ও মধ্যমা ভাঁজ হয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে। বক্ষদেশ সুডৌল, উন্নত। কাঁচুলী জাতীয় বস্ত্র দ্বারা ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত। সুগভীর নাভির নীচে কাপড় পরা। পায়ে নুপুর, গলায় রত্নহার, ডানহাতে কঙ্কন, দু'কানে কানপাশা। দেবী বাঁ পা হাঁটু মুড়ে উপবিষ্টা। ললিত ভঙ্গীতে ডান পা ভূমি স্পর্শ করেছে। পায়ের নীচে বাস-রিলিফে দুদিকে দুটি করে চারটি ছোট ছোট মূর্তি। স্পষ্ট করে বোঝা না গেলেও দুটি পুরুষ মূর্তি ও একটি নারী মূর্তির আদল বেশ বোঝা যায়। মূল মূর্তির পাদপীঠের দু'পাশে গদাধারী ছোট দুটি মূর্তি। নাগছত্রের উপরে দুপাশে দুটি হনুমানের ছোট মূর্তি। গোটানো লেজ, বাঁ হাতে গন্ধমাদন ও ডান হাতে গদা নিয়ে পরিচিত উল্লম্ফন দৃশ্য থেকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। নাগফণার উপরে ঠিক মধ্যস্থলে একটি পুরুষ দেবতার মূর্তি, সিঁদুর লেপা থাকায় চেনা যায় না। আগে এই মূর্তিটির সঙ্গে কষ্টিপাথরের একটি শিবলিঙ্গও ছিল। বর্তমানে আর নেই। কেউ নিয়ে চলে গেছে।

পূজার ব্যবস্থাদি ঃ বর্মণ জমিদারদের সময় ধূমধাম সমারোহে পূজা হত, পাঁঠাবলি হত। বর্মণরা অন্যত্র চলে যাওয়ায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা সাধ্যমত পূজা করতেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর নিত্য পূজার ব্যবস্থা হয়। পলতাগড়ের বাসিন্দা হারাধন চক্রবর্তী পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতেন। স্বপনবাবু এই নিত্যপূজার জন্য কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করেন। হারাধনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বছর পঁয়তাল্লিশের নবকুমার চক্রবর্তী পূজার দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এখন নিত্যপূজার বদলে সপ্তাহে দু-একদিন পূজা করেন তিনি। দশহরা এবং ভাদ্রমাসের শেষদিন বেশ ঘটা করে পূজা হয়। আগে নিমাইবাবুই প্রধানতঃ উদ্যোগী হতেন। পথচলতি মানুষের দানে এবং গ্রামের মানুষদের সাহায্যে এই বড় পূজার ব্যবস্থা হত। স্বপনবাবুর পরিবার থেকেও পূজা পাঠানো হত। চাল, ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হত। পূজায় কোন আমিষ দ্রব্য ব্যবহৃত হত না। পূজার শেষে সকলের জন্য খিঁচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা থাকত। নিমাইবাবু বললেন যে, দু-একবার আট-নয় কড়া পর্যন্ত খিঁচুড়ি রান্না করা হয়েছে। বিগত কয়েক বছর মিথ্যা সমালোচনার মুখে পড়ে নিমাইবাবু নিজেকে এই উদ্যোগ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ফলে বর্তমানে জাঁকজমক বন্ধ হয়ে গেছে। তবে স্থানীয় যুবকেরা আবার ঘটা করে পূজা করার চিন্তাভাবনা করছেন। নিমাইবাবু আরও জানালেন যে, অনেকেই মায়ের কাছে মানসিক করেন। মনোকামনা পূর্ণ হলে ঘটা করে পূজা দিয়ে যান। দেবীমা যে জাগ্রতা তার প্রমাণ নিমাইবাবুও পেয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক কথা ঃ সন ১৩৪৫ সালের 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রী প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ, তাঁর 'সিংহপুর বা বর্ত্তমান সিঙ্গুর' নামক প্রবন্ধে এই মনসা মূর্ত্তিটির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—'সিঙ্গুর অঞ্চলে মৃত্তিকা খননকালে বহু প্রাচীন মূর্ত্তি পাওয়ার সংবাদ শুনা যায়; তন্মধ্যে পলতাগড় শীউপুকুরের ধারে একটা বটগাছের তলায় দুইটী প্রাচীন মূর্ত্তি আছে। একটী ভগ্ন বাসুদেব, অন্যটী অক্ষত সুন্দর

মনসামূর্ত্তি। মনসার উপরের দুই হস্তে চামর, নিম্নের দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ, বাম হস্তে আস্তিক মুনি উপবিষ্ট। মূর্ত্তিটি দেখিতে সুন্দর। চৈতন্যযুগের পূর্বে বাঙ্গালাদেশে এই মনসাপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল। সে সময়ে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারার্থে শত শত মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটি অপূর্ব্বপুরের একস্থানে খননকালে পাওয়া গিয়াছিল—রায়সাহেব ডাঃ সৌরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পূজার জন্য এই স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন।' এর সঙ্গে একটি অতি অস্পষ্ট ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিটিতে মূর্তিটি কিছুই বোঝা না গেলেও প্রতিমাটি যে-কোন গাছের নীচে চৌকোণা বেদীর উপর দন্ডায়মান তা বোঝা যাচ্ছে। এই রচনায় মূর্তির বর্ণনার সঙ্গে কয়েকটি স্থানে আমাদের পর্যবেক্ষণের অমিল আছে। যেমন নিম্নের দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ জাতীয় কিছু নেই। আঙ্গুলগুলি একটি বিশেষ মুদ্রায় সন্নিবিষ্ট আছে। উপরের দুই হাতে দেবী যে দুটি জিনিস ধরে আছেন তা আমাদের দুটি ত্রিফণা নাগদেহ বলে মনে হয়েছে। অবশ্য এ'দুটিকে কোন প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধা জাতীয় ফুল বলেও মনে হতে পারে। চামরের সঙ্গে কোন সাযুজ্য আছে বলে মনে হয় নি। লেখক মূর্তিটি যে চৈতন্যপূর্ব যুগের বলে অনুমান করেছেন তা সঠিক বলেই মনে হয়েছে আমাদের। এ বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণ পরে উল্লেখিত হয়েছে। ভগ্ন বাসুদেব মূর্তিটি সম্পর্কে কোন তথ্য বা জনশ্রুতি আমরা পাই নি। মূর্তিটি অপূর্বপুরের কোন স্থানে পাওয়া গিয়েছিল তার কোন তথ্য লেখক দেননি, হদিশ আমরাও পাইনি। আর রায়সাহেব ডাঃ সৌরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পূজার জন্য মূর্তিদুটিকে এই জনবিরল স্থানে এনে কেন রাখলেন তা আমাদের বোধগম্য হয় নি। তিনি পূজার্চ্চনার কোন ব্যবস্থা করেছিলেন কি না তাও উল্লেখিত হয়নি। স্থানীয় মানুষজন ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। এসব থেকে উপরোক্ত তথ্যটি ভ্রান্তিমূলক বলে আমাদের মনে হয়েছে।

১৩৫৬ সালে প্রথম প্রকাশিত 'বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব' নামক মহাগ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় মনসামূর্তি ও মনসাপূজা সম্পর্কে লিখেছেন—'বাঙলাদেশে যে-সব মনসাদেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের, ক্রোড়াসীন একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণ ঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক।' এই মূর্তি-নির্দেশ থেকে বিচার করলে আলোচ্য মূর্তিটিকে সহজেই মনসাদেবী বলে চিহ্নিত করা যায়। গন্ধমাদন হাতে হনুমানের মূর্তির উপস্থিতিতে এটি যে হিন্দু দেবীর মূর্তি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এটি কোনভাবেই বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলী বা প্রজননদেবী হারিতী নয়। আর মনসার ক্রোড়াসীন শিশুটি সম্ভবতঃ আস্তিক মুনি।

১৩৭৫ সালে প্রকাশিত সুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে পলতাগড়ের এই মূর্তিটির উল্লেখ আছে। সুধীরবাবুও এটিকে মনসামূর্তি বলে উল্লেখ করেছেন ও একটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন—'সিঙ্গুরের পলতাগড় অঞ্চলে পাথরের একটি প্রাচীন মনসামূর্তি আছে। এটি ঠিক কত কালের

প্রাচীন, তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় হুগলীর কোন এক স্থানে হয়তো এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তারপর মূর্তিটি হারাইয়া যায়। আজ থেকে সত্তর বছর আগে ১২৯৯ সালে আবার তা পাওয়া যায় চালকেবাটীর মোড়ল পুকুরে। রঘুনন্দনের 'তিথ্যাদিতত্ত্বম'-এর টীকায় কাশীরাম বাচস্পতি এই মনসাদেবীর একটি ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ উদ্ধৃতি কোথাকার, তার কোন উল্লেখ নেই। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই ধ্যানটি সংগ্রহ করিয়া নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে দেন। ধ্যানটি এই—

"হেমাম্ভোজনিভাং লসদ্বিষধরালঙ্কার সংশোভিতাম্ স্মোরাস্যাং
পরিতো মহোরগগনৈঃ সংসেব্যমানাং সদা। দেবীমাস্তিকমাতরং
শিশুসুতাং আসীন—তুঙ্গস্তনীং হস্তাম্ভোজযুগেন নাগযুগলং
সংবিভ্রতিমাশ্রয়ে।"

এই ধ্যানমন্ত্রের 'দেবীমাস্তিকমাতরং' শব্দটি থেকে ক্রোড়াসীন শিশুটি যে আস্তিক সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ও সুশান্ত কবিরাজ রচিত 'সাপের মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক' গ্রন্থটি ১৪০৯ সালের ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদটিতে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়ার প্রস্তরশিল্পী দ্বারা নির্মিত মনসামূর্তির আলোকচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এই দেবী দ্বিভুজা, ললিতাসনে উপবিষ্টা। ক্রোড়ে কোন শিশু নেই। মুখের ভাব গোলাকার, বাঙালী মেয়ের আদল সুস্পষ্ট। পাশাপাশি আলোচ্য মনসামূর্তির মুখের ভাব লম্বাটে, গ্রিসিয়ান আদল ফুটে উঠেছে তাতে। খানিকটা যেন পুরুষালি ভাব। এই বৈশিষ্ট্য থেকে বলা যেতে পারে যে মূর্তিটি পাল-সেন যুগের মূর্তিচিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুধীরকুমার মিত্র যে মূর্তিটির প্রতিষ্ঠাকাল চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দী বলে অনুমান করেছেন তা সঠিক বলেই মনে হয়।

শেষ কথা ঃ সুধীরকুমার মিত্র আলোচ্য মূর্তিটি সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতে মূর্তিটি যে বিদগ্ধমহলে যথেষ্ট পরিচিত ছিল তা বেশ বোঝা যায়। ধ্যানমন্ত্র রচনা এই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। তথাপি মূর্তিটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিভাবে হারিয়ে গেল সে রহস্যভেদ করতে কেউ অগ্রণী হননি। সুধীরকুমার মিত্রের বহু আলোচিত এবং হুগলি জেলা সম্পর্কে একমাত্র প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও মূর্তিটি যেন অবহেলিত থেকে গেছে। এমনকি এত প্রাচীন ও প্রায় নিখুঁত মূর্তিটি সংরক্ষণের জন্য কোন ব্যক্তি বা সংগ্রহশালা কেন উদ্যোগী হন নি তাও বেশ রহস্যজনক। মূর্তিটি বর্তমানে যেভাবে রয়েছে তাতে যে-কোনদিন পাচার হয়ে যেতে পারে। হারিয়ে যেতে পারে আমাদের পুরাকীর্তির এই অনুপম নিদর্শনটি এবং সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। কোন সংগ্রহশালায় অবিলম্বে মূর্তিটির সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তথ্যসূত্র :

১। নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব'; প্রথম প্রকাশ- ১৩৫৬, সপ্তম সংস্করণ; ফাল্গুন-১৪১৬, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩; পৃ- ৪৮৯।

২। সুধীরকুমার মিত্র, 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ'—৩য় খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৪ এপ্রিল ১৯৬৮, মিত্রাণী প্রকাশন, ২ কালী লেন, কলিকাতা-২৬, পৃ- ১০৬৯।

৩। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ও সুশান্ত কবিরাজ, 'সাপের মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক'; প্রথম প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৪০৯; লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৬০ জেমস লঙ সরণি, বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৩৪।

৪। শ্রী প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ, 'সিংহপুর বা বর্ত্তমান সিঙ্গুর', 'ভারতবর্ষ' (মাসিক পত্রিকা), ২৬ বর্ষ-১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, সন- ১৩৪৫ সাল।